IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীতচিন্তায় সংগীত ও ভাবের মনোদার্শনিক পর্যালোচনা

Psycho-Philosophical Analysis of Music and Emotion in Rabindranath Tagore's SangeetChinta

দিপা সাহা মম

গবেষক

শাস্ত্রীয় সংগীত বিভাগ

সংগীত ভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সারসংক্ষেপ

সংগীত নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ঠিক কিভাবে শুরু হয়েছে তা আমরা বিভিন্ন দার্শনিকদের মতবাদ পর্যালোচনা করলে তার উৎস উদ্ঘাটন করতে পারবো। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন দার্শনিক হিসেবে জগত জীবনকে নানা ভাবে নানা আঙ্গিকে দেখার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর সংগীতচিন্তা গ্রন্থের 'সংগীত ও ভাব' অধ্যায়ে সংগীতের সাথে আমাদের মনের যে গভীরতম সম্পর্ক রয়েছে তার মূল ভিত্তি হলো ভাববাদ ও আবেগবাদ; এই ভাবই যে সংগীতের প্রাণ সে বিষয়টিই বোঝাতে চেয়েছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানান অনুভূতির প্রকাশ ঘটে সংগীতের মাধ্যমে। সুরের যেমন ভাষা আছে, সেই ভাষার প্রকাশ ঘটে আমাদের ভাব ও অনুভূতির দ্বারা। কখনো আনন্দ আবার কখনো বা বিষাদ, সেই সমগ্র ভাব হলো আমাদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ। এই ভাবই যেন সংগীতে প্রাণ সঞ্চার করে, সে কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি তাঁর সংগীতচিন্তা গ্রন্থে। শাস্ত্রীয় সংগীতে প্রতিটি রাগ, লয় ও সুরের গঠনশৈলীগুলো আমাদের মধ্যে আবেগীয় প্রভাব ফেলতে সক্ষম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সম্পর্কে বলেছেন যে, রাগ-রাগিণীতে কড়ি ও কোমল স্বরের সামান্য পার্থক্য হলেও সুরের ভাবমূর্তি পরিবর্তিত হতে দেখা যায় এবং তা আমাদের মনের উপর প্রভাব ফেলে। শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ-রাগিনীকে তিনি ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন রাগের সুরের মধ্যেও তিনি কোন সুরগুলো আনন্দের বা কোন সুরগুলো দুঃখের হতে পারে তা নিজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যা এই

গবেষণার মাধ্যমে আমরা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবো। মনোদর্শনে আমাদের মন, ইন্দ্রিয়বোধ ও আচরণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এই গবেষণায় একজন মনোদার্শনিক হিসেবে গুরুদেবের সংগীতচিন্তায় 'সংগীত ও ভাবের' আলোচিত অংশে সংগীত সম্পর্কে তাঁর ভাবগত দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনার আলোচনা করা হবে। তথ্য সংগ্রহের উৎস হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীতচিন্তা গ্রন্থ, মনোদর্শন সম্পর্কিত মতবাদ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মূখ্য শব্দসমূহ : সংগীতচিন্তা, রাগ-রাগিনী, শাস্ত্রীয় সংগীত, রস, ভাব, মনোদর্শন।

ভূমিকা :

শিল্প মানেই নতুন সৃষ্টি যেখানে একজন শিল্পী তার নানা চিন্তাভাবনা, কল্পনার ও অনুভূতির মাধ্যমে নতুন কিছুর আবির্ভাব ঘটায়। সংগীত হলো তেমনই এক সৃষ্টি যেখানে আমাদের জীবনের নানান ভাব লুকিয়ে রয়েছে এবং বিভিন্ন দার্শনিকগণও সংগীতকে মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম উপায়স্বরূপ প্রাধান্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন দার্শনিক হিসেবে সংগীত নিয়ে এই অনুভূতি ও চিন্তাভাবনাগুলোকে একত্রিতভাবে তাঁর রচিত সংগীতচিন্তা গ্রন্থের 'সংগীত ও ভাব' অধ্যায়ে প্রকাশ করেছেন। ১২৮৮ খৃষ্ঠাব্দে ভারতী জৈষ্ঠ্য-তে 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দার্শনিক চিন্তাভাবনা এই জগত জীবনসহ সকল কিছুর উর্ধ্বে। তিনি প্রতিটি জিনিস নিয়েই অনেক সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ভাবে চিন্তা করেছেন। গুরুদেবের দর্শন বলে, মন দ্বারা আত্মার দর্শন সম্ভব। আত্মপ্রেমের দ্বারা যেমন আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়, তেমনি সকলের প্রেম জয় করে নেওয়া যায়। সংগীত নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা বহু বিস্তৃত। তিনি বলেছেন, "আনন্দে বা বিষাদে বা অন্যান্য মনোবৃত্তির উদয়ে সকল প্রাণীরই মাংসপেশিতে ও অনুভবজনক স্নায়ুতে উত্তেজনার লক্ষন প্রকাশিত হয়"। (ঠাকুর ২) তার মধ্যে একটি হলো সংগীত যার সাথে আমাদের সেই আনন্দ, বিষাদ, বিরহ, প্রেম সকল অনুভূতি জড়িয়ে আছে এবং অনেক দার্শনিকগণও এ বিষয়ে একই মতবাদ প্রকাশ করেছেন। মানব মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র বিভিন্ন অনুভূতির উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে আমাদের মানসিক ও শারীরবৃত্তীয় কাজের সমন্বয় ঘটায়। তাই আমরা যখন ভাব ও অনুভাবের দিক থেকে সংগীতকে উপলদ্ধি করি তখন গুরুদেবের এই কথার যথাযথ মর্ম অনুধাবন করতে পারি। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটিতে মনোদর্শনের আলোকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীতচিন্তা গ্রন্থের সংগীত ও ভাব অধ্যায়ের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি ও উৎস :

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীত ও ভাব নিয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত সংগীতচিন্তা গ্রন্থের সংগীত ও ভাব প্রবন্ধটিকে বলা যায় তথ্য সংগ্রহের প্রধান উৎস। রাগ-রাগিণীর সাথে মনের সম্পর্ক নিয়ে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে যেমন, শ্রী অমিয়রঞ্জন বন্দোপাধ্যায় এর রচিত *সংগীতের সৌন্দর্যচিন্তা* এবং স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের *রাগ ও*

রূপ ইত্যাদিসহ সংগীত সম্পর্কিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ অধ্যয়নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীতচিন্তা গ্রন্থের *সংগীত ও ভাব* অধ্যায়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, গুরুদেব রাগ সংগীতকে মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছে। আমাদের মনের বিভিন্ন অবস্থার সাথে সুরের সম্পর্ক রয়েছে। কেবলমাত্র স্বর গাওয়া হলে সেখানে ভাবের অনুপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। গুরুদেব এ প্রবন্ধে হাসি-কান্নার সুরের মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে তেমনি সংগীতে আনন্দ বিষাদের সুরের মধ্যেও যে তারতম্য রয়েছে তা ব্যক্ত করেছেন। বিভিন্ন রাগে কেন বিভিন্ন ধরণের ভাব লুকিয়ে রয়েছে, সংগীতজ্ঞদের নিকট তিনি সেই কারণ উদ্ঘাটন করার আহ্বান জানিয়েছেন। সুরের সাথে সাথে তালও আমাদের ভাব প্রকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম সে বিষয়টিও উক্ত প্রবন্ধটি অধ্যয়ণের মাধ্যমে আমরা উপলদ্ধি করতে পারি।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর *রাগ ও রূপ* গ্রন্থটিতে রাগের সাথে আমাদের মনের যে সম্পর্ক জড়িয়ে আছে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে বিভিন্ন রাগের ভাবমূর্তি কল্পনা ও তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।

সীতাংশু রায় এর রচিত *সংগীতচিন্তার রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থটিতে সংগীত-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়টিতে তিনি গুরুদেবের সংগীতের সুর ও তালকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া অপেক্ষা ভাব ও অনুভাবের সঞ্চারকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন স্বরবিস্তার হতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উৎপত্তি কেন হচ্ছে কবির সেই বৈজ্ঞানীক অনুসন্ধানের বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন।

মনোদর্শনের স্বরূপ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

দর্শন (Philosophy) হলো যা সামান্য জ্ঞান থেকে বিস্তৃতি লাভ করে এবং যেখানে মানুষের বিভিন্ন কল্পনা, চিন্তা, অনুভূতি ও উপলদ্ধি এসমস্ত কিছুর সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মানবদেহে আমাদের এই চিন্তা, অনুভূতি ও কল্পনাকে নিয়ন্ত্রন করে আমাদের মস্তিষ্ক। মনোবিজ্ঞান আমাদের অনুভূতি, চিন্তা, মানসিক ক্রিয়া ও আচরণসমুহের বৈজ্ঞানীক বিশ্লেষণ করে। অন্যদিকে, মনোদর্শন আমাদের অনুভূতি, চিন্তা ও আচরণগুলোর দার্শনিক ব্যাখ্যা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দর্শন বিশেষজ্ঞ না হলেও তিনি একজন মনোদার্শনিক। জীবন ও জগতকে তিনি অন্তরের বিশেষ অনুভূতির মাধ্যমে দর্শন করেছেন এবং সেই দর্শনই হলো তাঁর মনোদর্শন (Philosophy of Mind)। 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে তাঁর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনা থেকে আমরা তাঁর মনোদার্শনিকতার স্বরূপ উপলদ্ধি করতে পারি।

সংগীত ও আবেগ :

আমাদের মন ও ভাবের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, সংগীতে সুরের মাধ্যমে তারই প্রকাশ ঘটে। গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস সর্বপ্রথম এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন; তাঁর দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বজগত এক সাঙ্গীতিক ঐক্যে সুসংগঠিত এবং এই কারনে পীথাগোরাসকে

সঙ্গীতচিন্তার জনকরূপে সম্মানিত করা হয়।[1] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সংগীত ও ভাব'-এ যেসকল মতামত প্রকাশ করেছেন সেখানে হিন্দুস্তানী সংগীতের রাগ-রাগিণীর কথাই প্রধানভাবে উল্লেখ করেছেন। রাগ-রাগিণীর প্রচলিত নিয়মের উর্দ্ধে গিয়ে সেখানে তার ভাব প্রকাশের গুরুত্ব প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর রচনায়। তিনি বলেছেন, আমরা যেভাবে সংগীতের মাধ্যমে ভাব গ্রহন করি, সেভাবেই যেন তা শ্রোতার মনে পরিপূর্ণরূপে নিবিষ্ট করে দিতে পারি এবং তাঁর এই মতের সাথে হুগো রীম্যান এর মতেরও প্রতিফলন পাওয়া যায়- "সুর ও গানের উদ্দেশ্য হলো সুরকারের এক বিশেষ অভিজ্ঞতাকে শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করা"।[2] সংগীতের মধ্যে এমন শক্তি বিদ্যমান রয়েছে যা গায়ক ও শ্রোতা উভয়ের মধ্যেই ভাবের সঞ্চার ঘটাতে পারে। যিনি গায়ক তাকে সর্বপ্রথম সংগীতের ভাবকে আয়ত্ব করে নিতে হবে; কারণ ভাবকে সঠিকভাবে আয়ত্ব করার মধ্যে আনন্দবোধ রয়েছে এবং শ্রোতার মধ্যে তা সম্প্রসারণের মাধ্যমে শিল্পীর সার্থকতা পরিব্যাপ্তী লাভ করে।

আমাদের মানবমনকে বলা যায় একটি দ্বিমুখী ধারার সমন্বয়। আমরা যখন কোন কিছু পর্যবেক্ষন করি বা বিচার করি তার দুটি দিক হয়, একটি বাহ্যিক এবং অন্যটি অভ্যন্তরীন। সংগীত শ্রবণ করা যদি সেই বাহ্যিক দিক হয়, তবে অভ্যন্তরীন দিকটি হলো আমাদের অনুভূতি, আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং তার সাথেই জড়িয়ে আছে কিছু বৈজ্ঞানীক তত্ত্বসমূহ। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাই রাগকে বলেছেন, অন্তরবাহ্যবগাহী বা সাইকো-মেটেরিয়াল[3] পদার্থ। কারণ রাগ আমাদের অন্তরের অনুভূতিকে স্পর্শ করতে সক্ষম। কিন্তু এই অনুভূতি আসলে কী? যার কোন নিজস্ব রূপ নেই, যাকে চোখে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না তবে তা ভাবের সমন্বয়ে রসোপলদ্ধির সৃষ্টি করে থাকে। জার্মানীর প্রসিদ্ধ সুরকার ভাগ্‌নার এ বিষয়ে বলেছেন, "অনুভূতির ইন্দ্রিয় হচ্ছে ধ্বনি এবং তার শিল্প মাধ্যম হলো সংগীত"।[4] আমাদের জীবনে প্রতিটি ভাবের সাথে সুর জড়িয়ে আছে। যেমন, উত্তেজনা বা আনন্দ অনুভূতির সময় আমাদের কথার সুরের সাথে আমাদের দুঃখ জড়িত মুহূর্তের কথার সুরে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। রাগরাগিণীতেও এই আনন্দ ও দুঃখের আলাদা আলাদা রাগ রয়েছে। চঞ্চল প্রকৃতির রাগ শুনলে যেমন আমাদের মন প্রফুল্লিত হয়, তেমনি গম্ভীর বা শান্ত প্রকৃতির রাগ শ্রবণে আমাদের মন শান্ত বা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে এবং এটিই হলো ভাবের সাথে আমাদের আবেগের উত্থান পতন। ঠুমরীতেও আমরা ভাবের এই উত্থান পতন অধিক লক্ষ্য করতে পারি। উদাহরণ সরূপ-

যাও বহি তুম শ্যাম, যাহা সারি র্‌যায়ন জাগে হো।

হামসে কপট করত নিত ছ্যায়ল,

নিত সওতন কি ঘর যায়ে।।

[1] দ্রষ্টব্য- সঙ্গীতের সৌন্দর্যচিন্তা, পৃষ্ঠা-৩
[2] সঙ্গীতের সৌন্দর্যচিন্তা, পৃষ্ঠা- ২১
[3] রাগ ও রূপ, পৃষ্ঠা- ২৭
[4] সঙ্গীতের সৌন্দর্যচিন্তা, পৃষ্ঠা- ২০

এটি মিশ্র খাম্বাজ এর একটি ঠুমরী[5]। যার ভাবার্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরহিণী শ্রীরাধারাণীর অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। গিরীজা দেবী, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, বড়ে গোলাম আলী খাঁ প্রমুখ সহ আরও অনেকের গাওয়া এই ঠুমরীটির রেকর্ডিং রয়েছে এবং সেগুলো শুনলে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে, ঠুমরীটি গাইবার পদ্ধতি ও ভাব সকলেরই আলাদা আলাদা, অর্থাৎ একই গান একেকজন শিল্পী আলাদা আলাদা ভাব নিয়ে উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং প্রত্যেকেরই ভাব প্রকাশের ক্ষমতা আলাদা হয়ে থাকে। এছাড়াও ঠুমরীটিতে নানান ভাবের সংমিশ্রণও রয়েছে, কখনো বিরহ, প্রতীক্ষা, কখনো বা অভিমান, কখনো আকুলতা। ভাবের এই সংমিশ্রণতা সাধারণত ঠুমরীতেই বেশী পরিলক্ষিত হয়।

রাগরাগিনীতে কিছু নির্দিষ্ট স্বরসমূহের অংশগুলোও (phrases) আমাদের মধ্যে আবেগীয় প্রভাব ফেলে থাকে। এ বিষয়ে অস্ট্রিয়ান সুরকার Franz Schubert বলেছেন যে, "Changes in musical features such as the pace of the piece influence perceived and felt emotions". (Rogachev) প্রতিটি রাগেরই এমন কিছু বিশেষ চলন থাকে যেগুলো শুনলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি কোন রাগটি পরিবেশন করা হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো রাগের বাদী ও সমবাদী স্বর। রাগের চলনে যে স্বরটি অধিক স্পষ্টভাবে ব্যাবহৃত হয়, তা হলো *বাদী স্বর* এবং বাদী স্বর অপেক্ষা যে স্বরটি তুলনামূলকভাবে কম কিন্তু অন্যান্য স্বর অপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হয় তা হলো রাগের *সমবাদী স্বর*। সংগীত ও ভাবের একটি অংশে কবি বলেছেন, "কেহ যদি আজ গান করেন তবে তানপুরার কর্ণপীড়ক খরজ সুরের জন্মদাতাগণ তাহাকে কী চক্ষে সমালোচনা করেন? তাঁহারা দেখেন একটা রাগ বা রাগিনী গাওয়া হইতেছে কি না; সে রাগ বা রাগিনীর বাদী সুরগুলিকে যথারীতি সমাদর ও বিসম্বাদী সুরগুলিকে যথারীতি অপমান করা হইয়াছে কি না; এ পরীক্ষাতে যদি গানটি উত্তীর্ণ হয় তবেই তাঁহাদের বাহবাসূচক ঘাড় নড়ে"। কবি এখানে গায়ক ও শ্রোতার সমালোচনা করেই এই উক্তিটি করেছেন, কারণ রাগের ব্যকরণগত দিকে অধিক নজর দিতে গিয়ে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই ভাবের প্রতি উদাসীনতা লক্ষ্য করেছেন তিনি। ভাবের প্রতি উদাসীনতা নিয়ে তাঁর এই উক্তিটি যথার্থ হলেও, রাগ পরিবেশনকালীন সময়ে বাদী সমবাদী স্বরের দিকে নজর দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান রয়েছে। বাদী সমবাদী স্বর রাগের ভাব প্রকাশে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাগ পরিবেশনের সময় বাদী ও সমবাদী স্বরের যথাযথ ব্যবহারে রাগের মেজাজ আরোও স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন, রাগ ভৈরবের বাদী স্বর কোমল ধৈবত এবং সমবাদী স্বর কোমল ঋষভ। উদাহরণস্বরূপ রাগ ভৈরবের সংক্ষিপ্ত চলন-

সা রে গ ম প, গ ম ধ ধ প, ধধ পম প ম গ, গ ম রে রে সা

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে সমস্ত রাগে একটা দুঃখজড়িত বা গম্ভীর ভাব রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোমল স্বরের ব্যবহার রয়েছে। স্বরের চলনেও ধীরতা ও গম্ভীরতা লক্ষ্য করা যায় এবং এই রাগগুলোর শ্রবণে আমাদের মানসিক প্রভাবও প্রতিফলিত হয়। মনোবিজ্ঞানও সেই কথা প্রমান করেছে ২০১৭ সালের একটি গবেষনা অনুসারে, "89.8% of people report that they have cried while listening to music". স্বরের গতিবিধির বিকাশ থেকেই আমাদের রাগরূপের

[5] ঠুমরী- হিন্দুস্তানী সংগীতের একটি অন্যতম প্রধান গায়ন শৈলী। সাধারণত ভৈরবী, খাম্বাজ, তিলং, কাফী ইত্যাদি রাগে অধিক গাওয়া হয়।

প্রতি রসবোধ জন্ম নেয়, যে রস আমাদের মধ্যে আবেগের সঞ্চার ঘটায় ও ইন্দ্রিয়ে সাড়া জাগায়। গুরুদেব বলেছেন, দুঃখের যে রাগিনী গুলো রয়েছে সেগুলোর চলনও দুঃখের ন্যায় ধীর ও কোমল, যেমন- রাগ মিয়াঁ কি তোড়ী, বিলাসখানী তোড়ী, পুরিয়া, শ্রী ইত্যাদি। আর যেসকল রাগিনীর মধ্যে আনন্দ রয়েছে সেগুলো সুখ বা আনন্দ অনুভবের মতোই চঞ্চল ও প্রফুল্লিত। যেমন- শুদ্ধ সারং, বাহার, তিলোককামোদ ইত্যাদি চঞ্চল প্রকৃতির রাগ। উদাহরণস্বরূপ, এখানে রাগ তিলোককামোদ চলন দেওয়া হলো-

প ঢ়ি ঢ়ি সা রে গ সা রে প ম গ, রে গ় সা় নি, নি সা রে ম গ রে, রে গ সা।

রে ম প, রে ম প ধ ম গ, রে প ম গ, রে গ় সা় নি, প নি সা় রে় গ সা নি, নি সা।

এই চলনে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি স্বরই শুদ্ধস্বর এবং এর চলন গাইবার সময় দেখা যায় যে স্বরগুলোর মধ্যে স্থিরতা খুব কম। অর্থাৎ রাগটির চলনেই আমরা এর চঞ্চলতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারছি এবং সুরের এই লয় আমাদের মধ্যে ভাব এবং আবেগের সঞ্চার করতে সক্ষম।

আমাদের মনের একটি অন্যতম প্রধান শক্তি হলো আমাদের কল্পনা, যা কিনা একটি মনোবৈজ্ঞানীক ধারা (psychological process) এবং এই কল্পনার কাছে আমাদের চিন্তাশীল মন- মুক্ত, বিশাল ও প্রশস্ত। হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সংগীতের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি রাগ হলো ভৈরবী যার মধ্যে ঈশ্বরের আরাধনা ও প্রার্থনামূলক একটি ভাব রয়েছে। যেমন, পন্ডিত দামোদর রাগ ভৈরবীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

"স্ফটিকরচিতপীঠে রম্যকৈলাসশৃংগে

বিকচকমলপত্রৈরর্চয়ন্তী মহেশম্।

করঘৃতঘনবাদ্যা পীতবর্ণায়তাক্ষী

সকভিরিয়মুক্তা ভৈরবী ভৈরবস্ত্রী।।

এই ধ্যানের কল্পনায়- স্ফটিক-নির্মিত কৈলাসপর্বতের শিখরে একটি দেব-মন্দিরে প্রস্ফুটিত পদ্মের অর্ঘ্য দিয়ে ব্রহ্মচারিণী ভৈরবী শিবের অর্চনা করছেন। সাধিকা 'দেবং ভুত্বা দেবং যজেৎ' এই আদর্শে অনুপ্রাণিতা হয়ে শিব-ধ্যানে আত্মহারা। হাতে ঘনবাদ্য (অথবা বীণা)- সংগীত মূর্ছনার জাগ্রত প্রতীক, তিনি পীতবর্ণা ও তাঁর আয়ত নেত্র। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রত্যেক শিল্পীর ভৈরবীরাগিণীর আলাপ করা উচিত"।[6] স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'রাগ ও রূপ' গ্রন্থটিতে বর্ণিত এই অংশটির সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠকুরের বক্তব্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কবি তাঁর সংগীতচিন্তা গ্রন্থে সংগীতজ্ঞদের গায়নভঙ্গির সমালোচনা করেছেন। কারণ তাদের বিকৃত গায়নভঙ্গি ও গায়নশৈলী কবিহৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে নি। একজন শ্রোতার মনে সংগীত তখনই স্পর্শ করে যখন তার ভাব সম্পূর্নরূপে প্রতিফলিত হয়। শ্রোতার মনে রাগ-রস ও ভাবের সম্মিলিতরূপে কল্পনাবোধের ঔজ্জ্বল্যতা প্রকট হয়ে উঠে।

[6] রাগ ও রূপ (প্রথম ভাগ), পৃষ্ঠা- ২২৪- ২২৫

রাগরাগিণীকে শুধুমাত্র শাস্ত্রগত বা ব্যকরণগত দিক থেকে অনুসরণ করতে গিয়ে কোথাও যেন কবির মনে হয়েছে যে রাগের মধ্যে যে ভাব রয়েছে তার গুরুত্ব হারিয়ে যাচ্ছে। রাগ-রাগিনীতে সুরের চলন ও গায়কীর যে ধারা রয়েছে, শুধুমাত্র সেভাবে তাকে অনুসরণ না করে তাকে অন্তরের চোখ দিয়ে সাজিয়ে তুলতে হবে, তাকে যত্ন ভরে অলংকরণ করে তার সুসজ্জিত রূপের গঠন বিকাশ করতে হবে, যেন গাইবার সময় তার সেই সাজানো রূপ চোখের সামনে ভেসে উঠে। গুরুদেব তাঁর 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে সেই ভাবকে আঁকড়ে ধরার কথা বলেছেন। ভাবহীন গান যেন প্রাণহীন অবয়ব মাত্র। শিল্পী যখন সংগীতের এই ভাবকে আয়ত্ব করে নিতে পারেন, তখনই শ্রোতার মনে সেই ভাবের সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে, অবশ্যই অন্যতম প্রধান একটি ভূমিকা পালন করে আমাদের জ্ঞান। জ্ঞান আছে বলেই আমাদের মধ্যে চিন্তাভাবনা করা ক্ষমতা আছে এবং জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে ততই আমাদের চিন্তাভাবনা ও রুচি(Taste)-তেও পরিবর্তন আসবে। কারণ ব্যাক্তিবিশেষে আমাদের প্রত্যেকেরই ভালো লাগার ক্ষমতা আলাদা। উদাহরণ স্বরূপ, ধরা যাক কোন ব্যাক্তির সংগীত (সুর, তাল, লয় ইত্যাদি) সম্পর্কে বিশদ ধারণা নেই, সেই ব্যাক্তিটির কাছে একটি গানের ভালো-মন্দকে যাচাই করার মতো শাস্ত্রগত জ্ঞান না থাকলেও রুচিবোধের দ্বারা গানটি শ্রুতিমধুর কিনা তার বিচার করতে পারবে। অপরদিকে, যার শাস্ত্রগত ধারণা আছে তার বিচারবুদ্ধি ক্ষমতা পূর্বের ব্যাক্তি হতে অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের হবে। জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে এভাবেই মানুষের অভিজ্ঞতা ও রুচিবোধেরও পরিবর্তন হয়। তবে এই বিচার বিবেচনার দিকে অধিক লক্ষ্য রাখতে গিয়ে রাগরাগিনী যেন ভাবচ্যুত না হয়, কবিগুরু সেদিকেই আমাদের গুণী সংগীতজ্ঞদের নজর দিতে বলেছেন।

আবেগ সৃষ্টিতে রসবোধ :

ভাবের যে আস্বাদন আমাদের মধ্যে নানান অনুভূতি জাগিয়ে তুলে, আমাদের আনন্দ দেয় ও পরিতৃপ্ত করে তোলে, তা হলো রস। এই রস হলো সৌন্দর্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্বের অন্যতম প্রধান একটি উপাদান, একটি নান্দনিক অভিজ্ঞতা। রস আমাদের মধ্যে ভাবের সঞ্চার ঘটায়, আবেগের উপর প্রভাব ফেলে। রাগরস সৃষ্টিতে গায়কের অবদান থাকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমন শ্রোতারও সেই রসকে ভোগ করার মত মানসিক সহানুভূতি প্রয়োজন। শ্রোতার মধ্যে যদি অভিজ্ঞতা ও মনোযোগের অভাব থাকে তবে সেই রসভোগেও ব্যাঘাত ঘটবে, সংগীতের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ভাব প্রকাশেও বাঁধা আসবে। গায়কের পরিবেশনে যদি স্পষ্টতার অভাব থাকে তবে সেটিও রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে একটি ব্যাঘাত ঘটার কারণ হবে।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'রূপ, রস ও সুন্দর' গ্রন্থে বলেছেন, "আবেগ, অনুভব প্রভৃতির সঙ্গে ভাবের যে-দিকটি জড়িত রসের চরিত্র বোঝার জন্য তা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ"। সংগীত সাহিত্যে ৯ প্রকারের রসের কথা বলা হয়েছে; একে **নবরস**-ও বলা হয়। এগুলো হলো- শৃঙ্গার, করুণ, বীর, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, অদ্‌ভুত, বীভৎস ও শান্ত। ভরতের মতে রসের সৃষ্টি হয় নানান প্রকার ভাবের সমন্বয়ে- স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারীভাব। নিম্নে সাতটি স্বরের সাথে সম্পৃক্ত এই রসগুলোর একটি সারণী দেওয়া হলো-

স্বর	রস
ষড়জ	বীর, অদ্‌ভূত, রৌদ্র
ঋষভ	বীর, অদ্‌ভূত, রৌদ্র
গান্ধার	করুণ
মধ্যম	হাস্য, শৃঙ্গার
পঞ্চম	হাস্য, শৃঙ্গার
ধৈবত	বীভৎস, ভয়ানক
নিষাদ	করুণ

আমাদের মনোজগতে নানান ভাবে এই রসের ক্রিয়া চলতে থাকে এবং তা আমাদের মধ্যে ভাবকে পরিস্‌ফুটিত করে তোলে। রস থেকে স্থায়ীভাবের সৃষ্টি হয়, সেই ভাবই আমাদের মধ্যে আবগের বিকাশ ঘটায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রসের সাথে ৯ প্রকার ভাবের কথাও উল্লেখ রয়েছে-

রস	ভাব
শৃঙ্গার	রতি
হাস্য	হাস্য
করুণ	শোক
রৌদ্র	ক্রোধ
বীর	উৎসাহ
ভয়ানক	ভয়
বীভৎস	জুগুপ্সা
অদ্‌ভূত	বিস্ময়
শান্ত	শম

তবে হ্যাঁ, ভাব ও রসোপলব্ধির মাধ্যমে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে শ্রোতার মনযোগও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ সংগীত শ্রবণে শ্রোতার মন যদি উদাসীন থাকে, তাহলে সেখানে সংগীত যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন, শ্রোতার মনে তা কোনরকম প্রভাব ফেলতে পারবে না।

তালপ্রসঙ্গে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাবনা :

আমাদের ভাব ও আবেগের সাথে যেমন সুর জড়িয়ে রয়েছে তেমনি তালও রয়েছে। তাল আমাদের ভাবাবেগের উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম। আমাদের হৃদস্পন্দন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি কর্মই একটি ছন্দোবদ্ধ লয়ের মধ্যে আবদ্ধ। সংগীতে এই ছন্দোবদ্ধ লয়কেই তাল বলা হয়। এই তালের মধ্যেও ভাগ রয়েছে- বিলম্বিত ও দ্রুত। রাগ রাগিনী ও তালের মধ্যে ভারতীয় সংগীতের সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। কবি তাঁর সংগীতচিন্তা গ্রন্থেও তালকে ভাব প্রকাশের একটি অঙ্গ হিসেবে বলেছেন। তাঁর মতানুযায়ী বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, বিলম্বিত এবং দ্রুত লয়ের তালে আলাদা ভাব প্রকাশের ক্ষমতা রয়েছে। গুরুদেবের মতানুসারে, আনন্দের গানগুলো গম্ভীর প্রকৃতির রাগের হলেও সেখানে আনন্দভাব প্রকাশের জন্য দ্রুত তাল বা মধ্যলয়ের তাল বসানো হয় এবং তাঁর যথার্থতা রয়েছে। যেমন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত একটি গান,

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে ॥
পান করি রবে শশী অঞ্জলি ভরিয়া
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে ॥

গানটি মালকোষ রাগের উপর রয়েছে এবং এই রাগের ঠাট হলো ভৈরবী। এটি একটি গম্ভীর প্রকৃতির রাগ। এই রাগে গ, ধ ও নি কোমল (পূর্বে আলোচিত তথ্যানুসারে গম্ভীর প্রকৃতির রাগগুলোতে কোমল স্বর বেশী প্রয়োগ হয়) হলেও এখানে এই গানের কথা ও তাল অনুসারে গানটি আনন্দের গান। জগতজুড়ে আনন্দের ধারা বইছে, সেই আনন্দের আলোতে জীবন জগত যেন পূর্ণ হয়ে আছে সেই অর্থই প্রকাশ পেয়েছে গানটিতে। রাগরাগিনীতে খেয়াল গান পরিবেশনার সময়ও লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিলম্বিত খেয়াল পরিবেশনার পর দ্রুত খেয়াল ও তান পরিবেশনকালে দর্শক তুলনামূলকভাবে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে, ভাবকে প্রাধান্য দিতে হলে সুর এবং তালকেও স্বাধীন করে দেওয়া উচিত। আমাদের ভারতীয় সংগীতে পুরো আবর্তন ঘুরে যেমন তেমন ভাবে সমে ফেরার ব্যাপারটিতে কবি দ্বিমত পোষন করেছেন। যেমন তেমন করে সমে ফেরার মধ্যে সংগীতের ভাবক্ষুন্ন হয় বলে তিনি মনে করেছেন। তাঁর এই বক্তব্যটির যথার্থতা রয়েছে, কারণ এর ফলে একজন গায়কের সুর ও তালের প্রতি অজ্ঞানতাই প্রকাশ পায়। কিন্তু এক্ষেত্রে বোধ করি, যেমন তেমন করে সমে ফেরার থেকে গায়ক বা শিল্পী কোন কায়দার মাধ্যমে অনায়াসে সমে আসতে পারছে, সেই দিকটিকে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। তাতে একদিকে যেমন ভাব প্রকাশেও ব্যাধাত ঘটবে না, ঠিক তেমনি শিল্পীর দক্ষতারও পরিচয় মিলবে বলে আমরা মনে করি।

তবে ভারতীয় সংগীতে তালের এই নিয়ম নিয়ে তাঁর প্রথমে আপত্তি থাকলেও, পরবর্তীতে তিনি ভারতীয় সংগীতের এই নিয়মকেই আদর্শ মনে করেছেন। কারণ ভারতীয় সংগীতের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্যতা রয়েছে, অন্য কোন পাশ্চাত্য সংগীতের মধ্যে তিনি এই স্বাতন্ত্র্যতার স্থান

খুঁজে পান নি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ভারতীয় সংগীতের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি বলেছেন-

"In European music you have a comparative liberty about time, but not about melody. But in India we have freedom of melody with no freedom of time". পাশ্চাত্য সংগীতে শিল্পীদের গায়কীর মধ্যে ভারতীয় সংগীতের মতো স্বরবিস্তার, আলাপ, তান ইত্যাদিতে যেমন শিল্পীর সৃজনশীলতা দেখানোর স্বাধীনতা রয়েছে, তা নেই। সেখানে রচয়িতার রচনাকে হুবহু একই ভাবে উপস্থাপন করার প্রবণতা রয়েছে, তাই সেদিক থেকে ভারতীয় সংগীতকে কবি আদর্শ মনে করেছেন।

উপসংহার :

উক্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধটিতে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধটির কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা করেছি। শিল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো তার সৌন্দর্য প্রকাশ করা। এই সৌন্দর্য যখন আশ্রয় নেয় আমাদের মনোজগতের কাছে, তখন আমরা তার রস উপলব্ধি করতে পারি এবং সেই রস আমাদের মধ্যে ভাবাবেগ তৈরী করে। প্রতিটি শিল্পেরই একটি স্বতন্ত্র্য সত্তা রয়েছে, সেই স্বাতন্ত্রিতকতার মধ্যেই তার পরিচয় ফুটে উঠে। কবি সেই স্বাতন্ত্যতার মধ্যে থেকেই সংগীতের ভাবকে গ্রহন করতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্যজীবন কেটেছে ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের মাঝে থেকেই এবং তাঁর বহু রচনায় বা জীবনস্মৃতিতে আমরা তাঁর সংগীতশিক্ষক হিসেবে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও যদুভট্টের কথা জানতে পেরেছি। তাদের গায়কীর মধ্যে সংগীতের ভাবের প্রতি কবির আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সংগীতচিন্তা গ্রন্থে তাঁর গায়ক ও গায়কীর ভাবের সমালোচনায় তৎকালীন সময়ে তিনি কাদের কথা বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট করে কোথাও উল্লেখ না থাকলেও তাঁর কিছু কথা অবশ্য যুক্তিসঙ্গত, যা এই গবেষনাপত্রে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। সংগীতশাস্ত্রে আমাদের ভারতীয় সংগীতের রাগরাগিণী নিয়ে বহু ব্যকরণগত পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের সংগীতশাস্ত্রে রাগসংগীতের যে সকল শাস্ত্রগত নিয়ম ও ব্যাখ্যাসমূহ রয়েছে, সেই ধারাকে আমাদের বজায় রাখা উচিত এবং বর্তমান যুগে আমরা চাইলেই অতীতের বহু শিল্পীদের গাওয়া গানের রেকর্ড হাতের মুঠোয় খুঁজে পাই। সংগীত শিল্পের ভাবের উন্নয়নে তাঁদের গায়কীকে অনুসরণ করলেও আমাদের অনুকরণ করা উচিত নয় কারণ, শিল্পের অনুকরণে তার ভাবহানী ঘটে। তাঁদের আদর্শকে ধরে রেখে এবং রাগের নিয়মকে বজায় রেখেই আমাদের ভাবকে আয়ত্ব করতে হবে এবং শিল্পের মধ্যে নতুনত্ব আনতে হবে।

ভবিষ্যত কাজের পরিসর :

এই গবেষনামূলক প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগীত ও ভাব প্রবন্ধে ভারতীয় সংগীতের রাগরাগিণীর ভাব ও গায়নভঙ্গি নিয়ে যেসকল মতামত প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী এবং যারা গবেষণা করতে আগ্রহী তারা কন্ঠসংগীতের বাইরে গিয়ে যন্ত্রসংগীতের ভাব ও আবেগ নিয়েও বিশদভাবে আলোচনা করতে পারবে। এই গবেষণাটি মনোবিজ্ঞানের আলোকেও করা যেতে পারে এবং কণ্ঠসংগীতের ক্ষেত্রেও নতুন নতুন আঙ্গিকে বিস্তৃত আলোচনা করতে পারবে।

গ্রন্থবিবরণী

1. বন্দোপাধ্যায়, অমিয় রঞ্জন. (১৯৯৫). *সঙ্গীতের সৌন্দর্যচিন্তা,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।
2. প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী. (১৯৬১). *রাগ ও রূপ,* স্বামী আদ্যানন্দ, কলিকাতা।
3. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. (১৩৭৩). *সংগীতচিন্তা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।
4. চৌধুরী, সুচেতা. (১৯৮৮). *সঙ্গীত ও নন্দনতত্ত্ব,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
5. চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ. (১৪২২). *দর্শন,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।
6. রায়, সীতাংশু. (১৯৯৭). *সংগীতচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ,* চয়নিকা, কলকাতা।
7. মুখোপাধ্যায়, অমিয়রতন. (১৩৮০). *রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন,* সাধনা মন্দির, কলিকাতা।
8. রায়, ডঃ সীতাংশু. (১৩৯১). *রবীন্দ্রসাহিত্যে সংগীতভাবনা,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা।
9. Sanyal, R. (1987). *Philosophy of Music*, Somaiya Publications, New Delhi.
10. বন্দোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র. (১৩৭৯). *সংগীতরত্নাকর,* রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
11. দত্ত, ড সুরেন্দ্রনাথ .(১৩৫৭). *সৌন্দর্যতত্ত্ব,* চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা।
12. মুখোপাধ্যায়, ডঃ হীরেন্দ্রনাথ. (২০০৭). *ভারতীয় সংগীতের আধুনিকতা নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষন,* ভারবি, কলকাতা।
13. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ. (১৯৮১). *রূপ, রস ও সুন্দর,* ঋদ্ধি-ইন্ডিয়া, কলিকাতা।
14. Rogachev, Y. (2025). *Music and Emotions: Why Do Certain Musical Pieces Evoke Strong Emotional Responses?*
15. Dutta, Sumita. 2024. *Exploring the Musical Connection Between Raga Bhairavi and Indian Folk Songs.* Sangeet Galaxy 13(1): 127-139. www.sangeetgalaxy.co.in